بسم الله الرحمن الرحيم

# লন্ডনের মর্ডেনস্থ বায়তুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৪ এপ্রিল, ২০১৫ মোতাবেক ২৪ শাহাদত, ১৩৯৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

## ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

আজকাল একটি প্রশ্ন পূর্বের চেয়ে অধিক জোরালোভাবে উত্থাপন করা হয় আর তা করা হয় মূলত যুব সমাজের পক্ষ থেকে, যারা চিন্তা-চেতনায় যথেষ্ট পরিপক্ক নয়। এ ছাড়া ধর্ম বিরোধীদের পক্ষ থেকে বা সঠিক দিক-নির্দেশনা না থাকার কারণে যারা ধর্ম থেকে, বরং খোদা থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে, তাদের পক্ষ থেকেও সমাজের সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে একটি প্রশ্ন ছড়ানো হয়ে থাকে। সেই প্রশ্নটি হল, চরিত্র যদি সত্যিকার অর্থে ভালো হয় বা জাগতিক শিক্ষা যদি মানুষকে উত্তম নৈতিকতার দিকে নিয়ে যায়, তাহলে ধর্ম মানার বা গ্রহণ করার প্রয়োজনই বা কী? ধর্ম বা ধর্মের মান্যকারীদেরও দাবি এটিই যে, ধর্ম মানুষকে উন্নত নৈতিক শিক্ষা দিয়ে থাকে। তারা বলে, এমন নৈতিক বৈশিষ্ট্য আমাদের মাঝে ধর্ম ছাড়াও সৃষ্টি হচ্ছে। বরং এটিও বলা হয় যে, অধিকাংশ জগৎ-পূজারী মানুষের চরিত্র ধর্মের মান্যকারীদের চেয়ে উত্তম। আর বিশেষ করে ইসলামকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়।

অন্যান্য ধর্মের অধিকাংশ মানুষ ধর্মের সাথে সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন করে বসেছে। শুধু ইসলামই এমন একটি ধর্ম, যে ধর্মের প্রতি আরোপিত সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী নিজ ধর্মকে মানার দাবি করে বা আমল-শূণ্য মুসলমানদেরও অধিকাংশ গর্বের সাথে মুসলমান হওয়ার দাবি করে বা ইসলামের প্রতি বা ধর্মের প্রতি আরোপিত হয়। তাই আসল আক্রমণ ইসলামের উপরই আসে আর ধর্মচ্যুত করার মানসে বিভিন্ন ছলনার আশ্রয় নিয়ে আমাদের শিশু এবং যুবকদের মন-মস্তিষ্ককে বিভিন্নভাবে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। বিশেষ করে পাশ্চাত্যে যে শিক্ষা পদ্ধতি রয়েছে, এতে প্রতিপাদ্য বিষয় অনুসন্ধান এবং গবেষণার প্রতি বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয়। এটি ভালো কথা, এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত, কিন্তু এরও সঠিক রীতি অনুসৃত হওয়া আবশ্যক।

যাহোক যুবক শ্রেণি বা যৌবনে পদার্পণকারী ছেলে-মেয়েরা যখন তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া প্রশ্ন বা মস্তিষ্কে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানের জন্য নিজেদের পরিবারের সদস্যদের কাছে এবং পিতা-মাতা ও জ্যেষ্ঠদের কাছে যায়, তখন নিজেদের অর্থনৈতিক বা সামাজিক প্রয়োজন ও ব্যস্ততার কারণে, হয় তাদের কাছে উত্তর দেয়ার সময় থাকে না নতুবা জ্ঞান থাকে না। এ কারণে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পরিবর্তে প্রায় সময় তাদেরকে অবদমিত করার বা তাদের মুখ বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়। যার ফলে যৌবনে পদার্পণকারী এসব ছেলেমেয়েরা মনে করে, ধর্ম—তা ইসলামই হোক না কেন, যদিও এটি দাবি করে যে, তা সত্য আর এতে সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে, কিন্তু যুগের নিরিখে ব্যবহারিক কোন সমাধান এটি উপস্থাপন করে না বা এর কাছে কোন উত্তর নেই, অথবা অনেক সময় জ্যেষ্ঠদের আচার-ব্যবহার এবং সন্তান-সন্ততিকে যে শিক্ষা দেয়া হয়, এ দুইয়ের মাঝে বিরোধ থেকে থাকে। সন্তান-সন্ততিরা একটি সময় পর্যন্ত তো শিক্ষণীয় কথা মেনে নিয়ে হয়তো মুখ বন্ধ করে রাখে, কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়া মাত্রই ধর্ম থেকে তারা দূরে চলে যায় এবং এরপর যারা ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যায়, তাদের থাবার শিকার হয়। এ

কারণেই ইসলামের শিক্ষা আকর্ষণীয় হওয়া সত্ত্বেও এবং ইসলাম জীবন্ত ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও আজ মুসলমানদের মাঝে এমন মানুষও দেখা যায়, যারা ধর্ম এবং খোদাকে অস্বীকার করে বসেছে।

**অতএব এমন পরিস্থিতিতে আমাদের প্রত্যেকের এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করার প্রয়োজন** রয়েছে যে, আমরা নিজেরাও কীভাবে ধর্মের উপর আমলকারী হতে পারি এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও কীভাবে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারি। এতে আদৌ কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলাম এক সম্পূর্ণ ও উৎকর্ষ ধর্ম এবং এতে বিভিন্ন সমস্যার বা প্রশ্নের সমাধান রয়েছে, আর পবিত্র কুরআন এক সম্পূর্ণ ও উৎকর্ষ ধর্মগ্রন্থ এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কুরআনের সর্বোত্তম আদর্শ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, আর এই আদর্শই সাহাবা রিযওয়ানুল্লাহ্ আলায়হিম-এর মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। তাঁরা ধর্মও বুঝেছেন এবং নৈতিকতার জ্ঞানও অর্জন করেছেন, বরং জাগতিক উন্নতিও লাভ করেছেন। কিন্তু প্রতিটি বিষয়কে নিজ স্থানে বা স্ব-স্ব স্থানে রাখার জ্ঞানও অর্জন করেছেন যে, ধর্মকে কোথায় রাখতে হবে, নৈতিক চরিত্র কোথায় অবস্থান করবে এবং জাগতিক উন্নতি-ইবা কী?

অতএব আমাদের যুবক শ্রেণি, যৌবনে পদার্পণকারী এবং বিশেষ করে বড়দেরও এটি স্মরণ রাখতে হবে, কেননা **ভবিষ্যৎপ্রজন্মকে নিয়ন্ত্রণের বা সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্ব জ্যেষ্ঠদের**। চারিত্রিক সংশোধন, জাগতিক উন্নতি এবং ধর্ম, এসবের আন্তঃসম্পর্ক বুঝার চেষ্টা আমাদেরকে করতে হবে এবং নিজেদের জীবনকে সে অনুসারে পরিচালিত করতে হবে। বড়রা যদি এই কথাটি বুঝে, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও তারা সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবে। যুবক শ্রেণি যদি এই কথা বুঝে, তাহলে ধর্মীয় এবং জাগতিক উন্নতির পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত হবে আর তারা বুঝতে পারবে যে, ইসলামী শিক্ষা কতই না অনুপম ও সুন্দর এবং এর বিরুদ্ধে অপলাপকারীরা হল মিথ্যাবাদী।

এ বিষয়টি, যা আজ অধিক উগ্রতার সাথে বিধর্মী বা ধর্মবিরোধীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়, এটি নতুন কোন বিষয় নয়। পূর্বেও বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। ধর্মের বিরুদ্ধে আপত্তিকারীরা এমনতর বিষয় আর এ ধরনের বিভিন্ন কথার অবতারণা সবসময়ই করে আসছে, যেন ধর্মের বিরুদ্ধে আপত্তি হতে পারে। আসলে ধর্মকে তারা কখনো সঠিকভাবে বুঝার চেষ্টা করে নি আর নামসর্বস্ব ধর্মীয় আলেমরা ভ্রান্ত সমাধান বের করে বা সঠিকভাবে ধর্মকে না বুঝার কারণে শিক্ষিত শ্রেণিকে আরো জটিলতার মুখে ঠেলে দিয়েছে। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি এ অনুগ্রহ করেছেন যে, এসব সমস্যার জট খোলার জন্য তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। তিনি (আ.) এগুলোকে বুঝার ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন জ্ঞান আমাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে এগুলো অনুধাবন করা এবং এর সমাধান খুঁজে বের করা আমাদের জন্য সহজসাধ্য হয়েছে। এই আলোকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একবার একটি খুতবা প্রদান করেন এবং তাতে তিনি এই বিষয়টি তুলে ধরেন যে, চারিত্রিক সংশোধন, জাগতিক উন্নতি এবং ধর্মের আন্তঃসম্পর্ক কী আর ইসলাম এটিকে কীভাবে দেখে? আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) কীভাবে স্বীয় আমল বা ব্যবহারিক আদর্শের মাধ্যমে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, এর স্বরূপ কী বা এসবের আন্তঃসম্পর্ক কী? আমি যেভাবে পূর্বেই বলেছি, তিনি (রা.) খুতবায় এ সম্পর্কে বর্ণনা করেন এবং সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করেন। সেটিকে কাজে লাগিয়ে এই বিষয়টি আজকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব।

## ইসলাম মানব প্রকৃতি-সম্মত ধর্ম

আমরা পৃথিবীর মানুষকে বলে থাকি আর এটি শতভাগ সত্য যে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা একান্ত মানব ফিতরত বা প্রকৃতিকে সামনে রেখে আল্লাহ্ তা'লা অবতীর্ণ করেছেন। ইসলাম

প্রকৃতিসম্মত ধর্ম বা দ্বীনে ফিতরত, এই বিষয়টিকে সামনে রেখে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

ধর্ম আর নৈতিকতা এবং মানুষের সেই সব চাহিদা, যা তার দেহের সাথে সম্পর্ক রাখে, এগুলো এতটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, এগুলোর মাঝে পার্থক্য করা কঠিন। যে ব্যক্তি ধর্মে বিশ্বাস করে, সে নৈতিকতাকে ধর্ম থেকে পৃথক করতে পারে না। আর সে এ কথাও বলতে পারে না যে, ধর্ম আমাকে জগত বিচ্ছিন্ন বা জগতের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন করে তুলেছে, তাই আমার এগুলোর কোন চাহিদা নেই। চিন্তাধারা যদি এই হয় যে, আমার এখন আর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, তাহলে মানুষের জাগতিক উন্নতির চাকা থেমে যাবে, অথচ এগুলো একটি অপরটির সাথে আন্তঃবন্ধনযুক্ত। ধর্ম, নৈতিকতা এবং জাগতিক উন্নতি, এর একটি অন্যটির সাথে পরস্পর সম্পর্ক-যুক্ত। কিন্তু তাসত্ত্বেও এগুলোর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। ভালো চরিত্র এবং জাগতিক উন্নতি মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়, এ কথা বলে ধর্মে অবিশ্বাসীরা বিবাগী হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু একজন প্রকৃত মুসলমান বলবে, ধর্মেরও প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, তা খোদা পর্যন্ত পৌঁছার পথ দেখিয়ে থাকে।

অতএব এটি হল চিন্তাধারার পার্থক্য যে, এই বিষয়গুলোকে আমরা কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবো এবং এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক কীভাবে প্রতিষ্ঠা করবো। অন্যান্য ধর্ম এখন মৃতপ্রায়। কেবল ইসলামই এমন এক ধর্ম, যা এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক প্রমাণ করে। কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি ধর্মের মর্ম না বুঝার কারণে ভ্রান্তভাবে নৈতিকতা ও জাগতিকতার সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদিকে ধর্মের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করেছে যে, তা বাড়াবাড়ির চরমে পৌঁছে গিয়ে, ধর্মকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের পরিবর্তে এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে আকর্ষণের পরিবর্তে ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দেয়ার কারণ হচ্ছে। নামায, রোযা থেকে সরে গিয়ে বিভিন্ন জাগতিক কাজ, যেমন- কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠা বা কোন সভার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রেও আলেমরা সাধারণত এটিই বলে যে, আমাদের মতে এগুলো সবই ইসলামের অঙ্গ, আর যারা এতে যোগ দেবে না, তারা কাফের এবং মুরতাদ। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৭তম খণ্ড, পৃ: ৪৬২-৪৬৩)**

ইসলামী-বিশ্বে এখন আমরা এটিই দেখতে পাই। আর যখন এর প্রসার বা বিস্তার ঘটে, তখন তা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে ফেলে। তখন তা কেবল কাফের আর মুরতাদের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। সব ফিরকার নিজস্ব ফতোয়া রয়েছে, আর এ কারণেই কট্টরপন্থী বিভিন্ন দল নিজেদের বানানো ইসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের নৈতিক বা চারিত্রিক আচরণবিধি বা নামসর্বস্ব আইন প্রণয়ন করে অন্যদের হত্যা করছে ও রক্তপাত ঘটাচ্ছে। সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে ধর্মের নামে তাদের নিজেদের বানানো আইন বা নিয়ম-কানুনই রক্তপাতে পর্যবসিত হচ্ছে। ইরাক ও সিরিয়ায় যে নামসর্বস্ব ইসলামী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখান থেকে এক ফরাসি সাংবাদিক মুক্তি লাভ করে ফিরে এসেছেন। আমি পূর্বেও বলেছিলাম যে, এই ব্যক্তি সেখানে এমন কিছু বিষয় দেখেছে, আর তাদের এমন কিছু আচরণ এবং আইন লক্ষ্য করেছে যে, ইসলামের যতটা জ্ঞান তার ছিল বা যতটা কুরআন সে পড়েছিল অথবা হাদীসের যে জ্ঞান তার ছিল, সে অনুসারে সেখানকার কিছু লোককে সে জিজ্ঞেস করে যে, তোমাদের কতক আচরণ তো কুরআন এবং হাদীস সম্মত নয়। তখন নামধারী ইসলামী রাজত্বের কর্মী বা কর্মকর্তাদের উত্তর এটিই ছিল যে, কুরআন হাদীসে কী আছে তা আমরা জানি না। এটি হল আমাদের আইন আর আমরা সেই অনুসারে চলছি। আর এভাবেই ইসলামী শিক্ষাকে তারা বিকৃত করছে।

**ইয়েমেনে যা কিছু হচ্ছে, তা এ কারণেই যে**, নিজেদের মনগড়া ফতওয়াকে ধর্মের নাম দিয়ে নিরীহদের উপর বিমান হামলা করা হচ্ছে। এটি ঠিক যে, উভয় পক্ষেরই দোষ-ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু নিরীহদেরকে বিনা কারণে হত্যা করা এর সমাধান নয়। বরং আমরা যদি ইসলামের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে আমরা দেখতে পাই, আর আজ পর্যন্ত এটিই হয়ে আসছে যে, অমুক মওলানা সাহেবের ধর্ম এই আর তমুক আলেম সাহেবের বিশ্বাস ওই। অর্থাৎ সকল আলেম এবং মওলানা নিজেদের ইচ্ছেমত ধর্ম গড়ে নিয়েছে বা আবিষ্কার করেছে। এভাবে ইসলামে অর্থাৎ, এদের বানানো ইসলাম, যার অনুসরণ তারা করছে, তার কোন বাস্তবতা নেই। আর এ কারণেই এ সকল আলেম এবং ফতোয়াবাজদের অনুসরণ করে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী ইসলাম থেকে দূরে সরে পড়ছে। আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্মের নামে হেন কাজ নেই, যা হচ্ছে না।

পক্ষান্তরে ধর্ম থেকে বিচ্যুত এবং পাশ্চাত্যের উন্নত লোকেরা আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতাকে বস্তুজগতের বিষয় হিসেবে দেখাতে চায়। ইলহাম নিয়ে চিন্তা করলেও তারা বলে যে, এগুলো মানবীয় কর্মেরই অংশ। তারা নৈতিকতা সম্পর্কে চিন্তা করলেও এই দৃষ্টিকোণ থেকে করে যে, এর ফলে মানুষের জাগতিক লাভ হবে এবং নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি জাগতিক কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। আর ধর্ম নিয়ে ভাবলেও তারা এটিই বলবে যে, নিম্নমানের এবং অ-শিক্ষিত বা স্বল্প-শিক্ষিত মানুষ ধর্মের নামে কিছুটা হলেও অপরাধ এড়িয়ে চলে, অর্থাৎ ধর্মের নাম নেয়ার কোন লাভ যদি এদের হয়, তাহলে শুধু এতটাই যে, ধর্মভীতির কারণে তাদের কিছুটা চারিত্রিক উন্নতি হয়, কিন্তু তাও যদি সঠিক ধর্মের অনুসরণ করা হয়। আর তারা এটিও বলে যে, পূর্ব থেকেই যাদের ভিতর নৈতিক-গুণাবলী রয়েছে, তাদের জন্য ধর্মের প্রয়োজনই বা কী?

কিন্তু প্রণিধানে **বুঝা যায়, বস্তুবাদিতা, নৈতিকতা এবং ধর্মের অবস্থান এত কাছাকাছি** যে, সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারে না, এর একটির সীমা কোথায় আরম্ভ হয় আর কোথায় ই-বা তা শেষ হয়। এটি বুঝার জন্য মহানবী (সা.)-এর পবিত্র-জীবনী নিয়ে চিন্তা এবং প্রণিধান করলে আমরা দেখি যে, তিনি (সা.) পৃথিবীর জাগতিক এবং নৈতিক-সংশোধনকারীও, আর আধ্যাত্মিক-সংস্কারকও বটে। তাঁর (সা.) পবিত্র জীবন এই সবকিছুরই সমাহার। একদিকে তিনি যেমন এই নির্দেশ দেন বা এই কথা বলেন যে, **'আদ্ দোয়াও মুখ্খুল ইবাদাহ্'**, তেমনি অপর দিকে আধ্যাত্মিক-উৎকর্ষ অর্জনের জন্যও তিনি জোর দেন। শুধু এটিই নয় যে, নামায পড়ে নিয়েছি আর সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, বরং আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন স্তরও পাড়ি দিতে হবে, আর আধ্যাতিকতাকে বৃদ্ধিও করতে হবে। খোদা এবং বান্দার মাঝে দোয়ার সম্পর্ক তেমনি হয়ে থাকে, যেমন সম্পর্ক এক শিশু ও মায়ের মাঝে হয়। দোয়ার অর্থ হল ডাকা বা আহ্বান করা। কোন আহ্বানকারী কাউকে তখনই আহ্বান করে বা ডাকে, যখন তার এই দৃঢ়-আস্থা থাকে যে, সে আমাকে সাহায্য করবে। কেউ কখনো শত্রুকে সাহায্যের জন্য ডাকে না। আমরা যখন দোয়া করি বা দোয়া করতে চাই, তখন সেটিকে আমাদের কিভাবে দেখা উচিত বা নেয়া উচিত? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর মতে দোয়ায় তিনটি জিনিস থাকা অত্যাবশ্যক।

**প্রথমত** হৃদয়ে এই দৃঢ়-বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমার কথা গৃহীত হবে। **দ্বিতীয়ত** এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, যাকে আমি ডাকছি, তাঁর মাঝে সাহায্য করার শক্তি আছে। **তৃতীয়ত** এক সহজাত বা প্রকৃতিগত সম্পৃক্ততা বা সংশ্লিষ্টতা তাঁর সাথে থাকা চাই, যা মানুষকে অন্য সব কিছু থেকে বিমুখ করে তাঁর দিকে নিয়ে যায় (অর্থাৎ আল্লাহর দিকে বা যার সাথে তার ভালোবাসা থাকে, তাঁর দিকে)। প্রথম দু'টি তো যৌক্তিক কথা, কেননা যদি এই বিশ্বাস না থাকে যে, আমি যে দোয়া করছি, তা গৃহীত হবে, আর যদি এই আত্মবিশ্বাস না থাকে যে, যাকে আমি ডাকছি

তাঁর মাঝে সাহায্য করার শক্তি আছে, তাহলে তাঁকে সাহায্যের জন্য ডাকা এক নির্বোধের কাজ হবে। দোয়া তখন এক অর্থহীন বিষয় হয়ে যায়। তৃতীয় কথা হল, সহজাত বা প্রকৃতিগত আকর্ষণ ও ভালোবাসা, যা মানুষকে অন্য সবকিছু থেকে বিমুখ করে, চোখ বন্ধ করে শুধু সত্যিকার প্রেমাস্পদের দিকে নিয়ে যায়। এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ, শিশু এবং মায়ের সম্পর্ককে উপস্থাপন করা যায়, যা পূর্বেও বলা হয়েছে। মায়ের সাথে সন্তানের এক সহজাত সম্পর্ক থাকে। মা সন্তানের সাহায্য করতে পারুক বা না পারুক, সন্তান বা শিশু মাকেই ডাকে। এমনকি সমুদ্রে নিমজ্জমান এক শিশু এটি জানা সত্ত্বেও যে, আমার মা সাঁতার কাটতে জানেন না, মা যদি তার পাশে থাকে, তাহলে সে সাহায্যের জন্য মাকেই ডাকবে, অন্য কাউকে সে ডাকবে না। এটি একটি আবেগজনিত সম্পর্ক। এ সম্পর্কেই রসূল করীম (সা.) বলেছেন, **'আদ্ দোয়াও মুখ্খুল ইবাদাহ্'** অর্থাৎ দোয়া ছাড়া মানুষের ঈমান কোনভাবেই সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। অতএব মহানবী (সা.), বান্দা এবং আল্লাহ্ তা'লার মাঝে সম্পর্ককে এক শিশু এবং মায়ের সম্পর্কতূল্য আখ্যা দিয়েছেন, অর্থাৎ চোখ বন্ধ করে তাঁর দিকে ধাবিত হও, তাঁর দিকে ছুটে যাও।

অতঃপর দ্বিতীয় বিষয় হল, আখলাক বা নৈতিক-চরিত্র। এক্ষেত্রে আমরা দেখি, রসূল করীম (সা.)-এর জীবনে এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চারিত্রিক দিক বিদ্যমান যে, এক সূক্ষ্মদর্শীর দৃষ্টিও তা দেখতে পারে না এবং সে পর্যন্ত যেতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দিক-নির্দেশনা না থাকে।

**এরপর রয়েছে স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার এবং ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের বিষয়টি**। ঘরের পরিবেশকে সুমধুর রাখার জন্য এটি অত্যাবশ্যক। ইহা মৌলিক চারিত্রিক-গুণাবলীর অন্তর্গত একটি বিষয়। স্ত্রীদের বিষয়ে তিনি (সা.) কত সূক্ষ্মতার সাথে দৃষ্টি রাখতেন দেখুন। হাদীসে তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর কোন স্ত্রী যখন পাত্রে পানি পান করতেন, তখন মহানবী (সা.) পানি পান করার সময় পাত্রের সেই জায়গায় ঠোঁট রেখে পানি পান করতেন যেদিক দিয়ে তাঁর স্ত্রী পানি পান করেছিলেন। এটি খুব ছোট্ট একটি বিষয়, কিন্তু কত সূক্ষ্ম একটি কথা! অর্থাৎ- মানুষের ভালোবাসা শুধু বড় বড় বুলির মাধ্যমে নয়, বরং ছোট ছোট বিষয়ের মাধ্যমেও প্রকাশ পায়। শুধু তাই নয় বরং তাঁর জীবনী অধ্যয়নে জানা যায় যে, বড় বড় নৈতিক-বিষয়েও তিনি এমনসব শিক্ষা দিয়ে গেছেন, আর এমন উত্তম আদর্শ প্রকাশ করেছেন যে, তা দেখলে মনে হয়, তিনি যেন সারা জীবন শুধু নৈতিকতারই অধ্যয়ন করেছেন আর এরই পাঠ দিয়েছেন। মানব জাতির পারস্পরিক-সম্পর্ক, আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক-সম্পর্ক, মানুষের নিজের ব্যক্তিগত চরিত্রের খুঁটিনাটি বা বিস্তারিত দিক, মিথ্যা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, কুধারণা পরিহার, এই সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ এবং শিক্ষা হল উৎকর্ষ এবং পরিপূর্ণ। অন্য কোন ব্যক্তি শত শত বছর জীবন পেয়েও এমন উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে না যা মহানবী (সা.) আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন।

এরপর তৃতীয় বিষয় হল জাগতিকতা। এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা এক্ষেত্রেও আমাদেরকে পথের দিশা দান করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নাগরিক-জীবনের জন্য রাস্তা প্রশস্ত রাখা এবং পানি বিশুদ্ধকরনের ব্যবস্থার বিষয়টি রয়েছে। যখন কোন শহর গড়ে তোলা হয়, বা নতুন জনবসতি গড়ে উঠে, তখন বড় বড় প্রকৌশলী এবং চিন্তাবিদেরা এ সম্পর্কে চিন্তা করে এবং এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি (সা.)ও এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রাস্তা পরিষ্কার রাখার দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঘর প্রশস্ত রাখা এবং বাতাস চলাচলের জন্য অনুকূল করে ঘর নির্মাণ করার দিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জাগতিক সকল বিষয়াদির প্রতিও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তা সরকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ই হোক বা সামাজিক অথবা বাণিজ্যিক কিংবা শিল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ই হোক না কেন। সবকিছুই তিনি নিজ নিজ

স্থানে বর্ণনা করেছেন আর এর বিশদ বিবরণও তাঁর আচরিত জীবন থেকে আমরা জানতে পারি। কিন্তু তাসত্ত্বেও হাল-আমলের ধর্মীয়-নেতৃবৃন্দের ন্যায় সবকিছুকে তিনি ধর্মের অঙ্গ আখ্যা দেন নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাঁর (সা.) সম্পর্কে একটি ঘটনা আমরা দেখতে পাই। কয়েকজন কৃষক নর খেজুর গাছের পরাগরেণু দিয়ে মাদী খেজুর গাছের পরাগায়ণ করছিল। (নর ও মাদী খেজুর গাছ পৃথক পৃথক হয়ে থাকে) তিনি (সা.) সেই পথ ধরে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, এভাবে পরাগায়িত না করলে কী অসুবিধা? বাতাসের মাধ্যমে প্রকৃতিগতভাবেই এদের পরাগায়ণ সম্ভব। মানুষ তাই পরাগায়ণ করা ছেড়ে দেয়। সে বছর বা পরের বছর এমনটি না করার কারণে খেজুরের ফলন অনেক কমে যায়। তিনি (সা.) কারণ জিজ্ঞেস করলে মানুষ বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনিই বারণ করেছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে এর কোন নির্দেশ দেই নি। জাগতিক এসব বিষয়াদি তোমরা আমার চেয়ে ভালো জান।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এখানে মহানবী (সা.) যেন জাগতিক-বিষয়কে ধর্ম থেকে পৃথক করেছেন। কেননা সে কথাও আল্লাহ্‌র রসূলেরই ছিল, যিনি বলেছিলেন, এভাবে পরাগায়ণের কী প্রয়োজন? আর সেই একই মুখ আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ সম্পর্কেও আমাদেরকে অবহিত করতো। কিন্তু তা আল্লাহ্‌র রসূলের কথা হওয়া সত্ত্বেও, পরাগায়ণকে তিনি জাগতিক বিষয় আখ্যা দিয়ে বলেন যে, তোমরা এসব বিষয় অধিক জান। কিন্তু বর্তমান যুগের মৌলভীদের মুখ থেকে কোন অসম্ভব কথা বের হলেও যারা সেটি মানবে না, তাদের ক্ষেত্রে তখন ইসলামের গণ্ডি থেকে বহির্ভূত এবং কাফের আর মুর্তাদের প্রশ্ন এসে দণ্ডায়মান হয়।

**অপরদিকে রয়েছে নামধারী উন্নত শ্রেণীর পাশ্চাত্যের সব মানুষ**। তাদের দৃষ্টিতে ধর্মের উপর ঈমান আনারও প্রয়োজন নেই, আর ধর্মীয়-শিক্ষারও কোন সম্মান নেই। আর না নৈতিকতার কোন সম্মানজনক অবস্থান তাদের কাছে রয়েছে। তারা সবকিছুকে জাগতিক আখ্যা দিয়ে থাকে। এমনকি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, এ যুগে তাদের দার্শনিকদের কথা হল, প্রশ্ন এটি নয় যে, খোদা পৃথিবীকে কীভাবে সৃষ্টি করেছেন, বরং প্রশ্ন হলো, মানুষ খোদাকে কীভাবে সৃষ্টি করেছে! নাঊযুবিল্লাহ্! তাদের দৃষ্টিতে খোদা হচ্ছেন মানুষের বিবর্তিত চিন্তাধারারই ফসল। তাদের কাছে খোদার সত্তা বাস্তব হলেও, তা মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক উন্নতিরই ফসল, এর বেশি কিছু নয়। তাদের মতে মানুষ এক উত্তম-আদর্শের সন্ধানে ছিল। মানুষের মাঝে তারা যখন উন্নত কোন আদর্শ খুঁজে পায় নি, তখন তারা মানুষের জগতের বাহিরে এক মনস্তাত্ত্বিক-চিত্র অঙ্কন করেছে। আর কল্পনায় যে চিত্র অঙ্কন করেছে সেই চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে মানুষের প্রথম প্রচেষ্টা ততটা সফল ছিল না। কিন্তু উত্তরোত্তর প্রণিধান এবং চিন্তার ফলে এক পর্যায়ে সে তার মানসপটে এক কামেল চিত্র অঙ্কন করে, আর এর নাম হল খোদা। সে যুগের দার্শনিকের দৃষ্টিতে এ হল খোদার চিত্র বরং এখনও অনেকেই এ কথাই বলে থাকে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এভাবে এরা খোদাকেও জাগতিকতা বা বস্তুজগতের অংশ আখ্যায়িত করেছে। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৭ তম খণ্ড, পৃ. ৪৬৩-৪৬৬)**

সে যুগের দার্শনিকরা এভাবে মনগড়া-খোদা বানিয়েছিল, আর তাদের অনেকেই এমনও ছিল, যারা এই মনগড়া-খোদার প্রতি বিশ্বাসও রাখত। কিন্তু পরবর্তীতে আগত দার্শনিকরা, বা যারা উন্নত আখ্যায়িত হয়, তারা এভাবে মনস্তাত্ত্বিক-খোদা বানানোর কারণে ধীরে ধীরে ধর্ম থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। আর আজকাল এই দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ খোদা মানুষের আবিষ্কার- এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই বর্তমান দার্শনিকরা নাস্তিকতার পথ অবলম্বন করছে, বরং শিক্ষা ও আলোকিত ধ্যান-ধারণার নামে পাশ্চাত্যে বসবাসকারীদের অধিকাংশই খোদার সত্তাকে অস্বীকার করে বসেছে। তারা শুধু নৈতিক চরিত্র ও জাগতিক উন্নতিকেই সবকিছু মনে করে। আর এই

নাস্তিকতা-প্রিয় লোকদের যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, এতে আরো ইন্ধন যোগায় আজকালকার মৌলভীরা, যারা নিজেদের সকল ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ধর্মের অংশ আখ্যা দিয়ে অদ্ভুত সব অজ্ঞতার বিস্তার ঘটিয়েছে। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে, আজকালকার আলেমরাও ভ্রান্তিতে নিপতিত, আর ধর্মকে যারা জাগতিকতার মতই দেখে এবং যারা একে অস্বীকার করে তারাও ভ্রান্তিতে নিপতিত।

**আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান**। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে এসব বিষয় থেকে রক্ষা করে এই পথের দিশা দিয়েছেন যে, প্রকৃত বিষয় অনুধাবনের জন্য মহানবী (সা.)-এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। আর আসল বা প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন, সকল বিষয়ে মধ্যম-পন্থা অবলম্বন করা এবং ক্ষেত্র অনুযায়ী যা করণীয় তা করাই সত্যিকারের ধর্ম। তিনি (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে ইবাদত আবশ্যক বরং একান্ত আবশ্যক, এমনকি সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল ইবাদত। কিন্তু **'ওয়ালি নাফসিকা আলাইকা হাক্ব, ওয়ালি যাওজিকা আলাইকা হাক্ব, ওয়ালি জারিকা আলাইকা হাক্ব'** অর্থাৎ- তোমার নিজ প্রাণেরও তোমার উপর অধিকার আছে, তোমার স্ত্রীরও তোমার উপর অধিকার আছে, তোমার প্রতিবেশীরও তোমার উপর অধিকার রয়েছে। আর এ অধিকার প্রদানের জন্য আমাদের তিন ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করা আবশ্যক। প্রথমত দোয়া এবং খোদার প্রতি বিনত হয়ে ঝুঁকা এবং ইবাদত করা। দ্বিতীয়ত কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং মানব-মনস্তত্ত্ব নিয়ে চিন্তা ও প্রণিধান করা। তৃতীয়ত নিজের কাজ এবং পেশায় সততা অবলম্বন করা এবং জাগতিক ও বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৪৬৬-৪৬৭)**

আমরা যদি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখা যাবে যে, নিজ প্রাণের অধিকার প্রদানের জন্য দোয়া করা এবং খোদার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা আর আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করাও আবশ্যক। আবেগই অনেক সময় লাগাম ছাড়া হয়ে নিজ প্রাণের অধিকার থেকেও মানুষকে বঞ্চিত করে বা অন্যায়ে প্রবৃত্ত করে। নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং নিজের পেশায় সততা অবলম্বনের মাধ্যমে আমরা নিজেদের জীবনের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে সঠিক ধারায় পরিচালিত করতে পারি। একইভাবে নিজেদের পরিবার-পরিজনের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রেও দোয়া করা, আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং জাগতিক-চাহিদা পূরণ করার প্রয়োজন রয়েছে। অনুরূপভাবে আরো বলা হয়েছে যে, তোমার প্রতিবেশীরও তোমার উপর অধিকার রয়েছে, অর্থাৎ- সমাজের অধিকারও তখনই প্রদান করা সম্ভব হবে, যখন আমরা এর জন্য দোয়া করবো, তাদের অধিকারও প্রদান করবো, আর তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বুঝে সে অনুসারে তাদের কাছে ধর্মের বাণীও প্রচার করবো। ধর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা, এটিও তাদের প্রাপ্য-অধিকার। অনুরূপভাবে নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি এবং কর্মের ক্ষেত্রে পরিশ্রমের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে দেশীয়-উন্নতিতেও আমরা ভূমিকা রাখবো। এটিও প্রতিবেশী এবং সমাজের অধিকার প্রদানেরই অন্তর্ভুক্ত। আর এই চিন্তা-চেতনা নিয়ে যদি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি চেষ্টা করে, তাহলে সেই সমাজ আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং জাগতিক, এক কথায় সকল প্রকার উন্নতির উত্তম-দৃষ্টান্ত হবে।

## মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার কারণ

**মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় হবার কারণ হল, তারা খোদাকে** এবং খোদার মনোনীত ধর্মকে অগ্রগণ্য করার প্রতি এবং এই বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান ছিল না, যা আমি এইমাত্র বর্ণনা করেছি। তারা বরং নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে ধর্মের নাম দিয়েছে। যেই ধর্ম আল্লাহ্ তা'লা নাযেল করেছেন, সেটিকে তারা অগ্রগণ্য করে নি। কেননা যদি এটিকে প্রাধান্য দেওয়া হতো, তাহলে বাকি বিষয়গুলোর প্রতিও তারা খেয়াল রাখতো। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে ধর্মের

নাম দিয়ে তারা সেটির অনুসরণ করছে। আর এর ফলাফল যা দাঁড়িয়েছে, তা হল, অন্যদেরকে ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত করা তো দূরের কথা, বরং মনগড়া সেই ধর্মের অনুসরণ করে স্বয়ং মুসলমানই মুসলমানের শিরচ্ছেদ করছে ও রক্তপাত ঘটাচ্ছে। এরা ধর্মও লাভ করতে পারে নি আর দুনিয়াও পায় নি, বরং তারা কেবল এই দুনিয়ার লোকদের সামনে নিজেদের সকল বিষয়ের সমাধানের জন্য হাত পাতছে। মুসলিম বিশ্বে আজ আমরা এটিই দেখতে পাচ্ছি। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতি যদিও ধর্মকে জাগতিকতার অধীনস্ত করেছে, তাদের দৃষ্টিতে ধর্ম বলতে কিছু নেই, জাগতিকতাই সব কিছু, নিঃসন্দেহে এরাও বিভ্রান্ত। কিন্তু তারা যেটিকে লক্ষ্য মনে করতো, সেটি ভ্রান্ত হলেও, তারা তা অর্জন করেছে। তারা তো জাগতিকতাকে অর্জন করেছে, কিন্তু মুসলমানরা, না ইহকাল পেয়েছে আর না পরকাল।

**যাহোক, এই উভয় প্রকার মানুষের সংশোধনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন**। আর এমন পরিস্থিতিতেই আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রত্যাদিষ্টদেরকে প্রেরণ করে থাকেন, যারা সঠিক পথের দিশা দিয়ে ধর্মকে ধর্মের স্থানে, নৈতিকতাকে নৈতিকতার স্থানে, আর জাগতিকতাকে জাগতিকতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাহ্যত তাঁরা ঐশী-বার্তা নিয়ে আসেন, কিন্তু এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে সুগভীর আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। আধ্যাত্মিকতার পরাকাষ্ঠা লাভের মাধ্যমে চারিত্রিক-সংশোধন হওয়া আবশ্যকীয় বিষয়, আর চারিত্রিক সংশোধনের মাধ্যমে জাগতিক-সংশোধনও অবশ্যম্ভাবি। কিন্তু এটি হতে পারে না, বা এটি আবশ্যক নয় যে, যার ইহজাগতিক বিষয়াদি সঠিক খাতে পরিচালিত হবে, দুনিয়াতে সে সবকিছু পেয়ে যাবে। অর্থাৎ- দুনিয়াতে যে উন্নতি করে, তার ব্যক্তি-চরিত্রও সংশোধিত হবে এটি অপরিহার্য নয়। আর যার চরিত্র সংশোধিত হবে তার ধর্মও সঠিক হবে এটিও আবশ্যক নয়। এর কারণ হল, মানুষকে নিজের দিকে নিয়ে আসা-ই আল্লাহ্ তা'লার লক্ষ্য, আর মানব-সৃষ্টির উদ্দেশ্যও এটি। তাই তিনি চারিত্রিক সংশোধন ও জাগতিক-উন্নতিকে ধর্মের অধীনস্ত রেখেছেন, যেন যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি দৃষ্টি দেয়, সে নিজে থেকেই সব কিছু পেয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সত্যিকার মু'মিন সকল প্রকার উন্নতি করে থাকে। কিন্তু যারা কেবল জাগতিকতায় মত্ত থাকে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (সূরা আল্ কাহফ:১০৫) অর্থাৎ তাদের সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা ইহজগতের পেছনেই নষ্ট হয়। এর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এক কথায় যারা আধ্যাত্মিকতা গ্রহণ করে অর্থাৎ উপর থেকে যারা নিচে আসে, তাদের জন্য সিঁড়ি রয়েছে, কিন্তু যারা নিচ থেকে উপরে যেতে চায় তাদের জন্য কোন সিঁড়ি নেই।

সুতরাং বুঝা গেল, পৃথিবীতে এই তিনটি বিষয় লাভের জন্যই পৃথক পৃথক মাধ্যম রয়েছে, কিন্তু একটি যৌথ মাধ্যমও আছে। আর তা হল, আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিগুঢ়-সম্পর্ক স্থাপন করা। চারিত্রিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করলে চারিত্রিক উন্নতি হবে। জাগতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করলে জাগতিক উন্নতি লাভ হবে। কিন্তু এর প্রত্যেক প্রচেষ্টার ফলাফল সেই গণ্ডির ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকবে, এর বাইরে যাবে না। কিন্তু যারা আধ্যাত্মিকতার সংশোধন করবে, তারা সব কিছু পেয়ে যাবে। সাহাবীগণ (রা.) বয়আতের সময় এ কথার উপর বয়আত করতেন না যে, গলি প্রশস্ত রাখব বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখব বা অন্যান্য জাগতিক-বিষয়ে সচেতন থাকব, বরং তারা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'** পড়তেন। এর মাধ্যমেই চারিত্রিক সংশোধনও হতো, আর চারিত্রিক সংশোধনের মাধ্যমে অবশ্যই ইহকালও সংশোধিত হতো। সে যুগে মুসলমানদের সত্যের মান ছিল আদর্শস্থানীয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে সততার কারণে পৃথিবীর মানুষ নিঃসংকোচে মুসলমানদের হাতে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিত। প্রজাদের সাথে ইনসাফ বা সুবিচার

দেখে মানুষ চাইতো যে, মুসলমানরা আমাদের শাসক হোক। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে একবার মুসলমানদেরকে সিরিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। কেননা তখন রোমান বাহিনীর সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে তাদের মোকাবিলা করা কঠিন ছিল। কিন্তু সিরিয়াবাসী প্রজারা তখন অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিল আর জোর দিয়ে বলছিল যে, আপনারা এখান থেকে যাবেন না, আমরা আপনাদের সাহায্য করছি। আমরা আপনাদের সাথে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে যোগ দিব। অথচ সিরিয়াবাসীরাও খ্রিষ্টান ছিল, আর রোমানরাও খ্রিষ্টান ছিল। কিন্তু এই উন্নত-চরিত্র আর উন্নত শাসন-ব্যবস্থার কারণে সিরিয়াবাসী খ্রিষ্টানরা রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য করতে অনুপ্রাণিত হয়। সুতরাং রাজত্ব যদিও একটি জাগতিক বিষয়, কিন্তু মুসলমানদের রাজত্ব জাগতিক ছিল না। এই রাজত্ব তারা ধর্মের কল্যাণেই লাভ করেছিলেন, তাই তারা ধর্মের অনুসরণ করতেন। আর এ কারণেই, এর মাঝে এমন অনেক গুণাবলী অন্তর্নিহিত ছিল যে, ধর্মীয়-মতভেদ থাকা সত্ত্বেও প্রজারা চাইতো যেন মুসলমানদের শাসন এবং তাদের রাজত্বই প্রতিষ্ঠিত থাকে। যদিও মুসলমানদের রাজত্ব 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-র কল্যাণেই লাভ হয়েছে, কিন্তু এটি কেবল মৌখিক-দাবি ছিল না, বরং সত্যিকার ঈমানের কল্যাণে তা লাভ হয়েছিল। কেননা মৌখিকভাবে দাবিকারী তো নিজের ইহজগতও হারিয়ে বসে। কিন্তু সত্যিকার ধর্মের অনুসরণকারীর চারিত্রিক-সংশোধনও হয়, আর ইহজাগতিক উন্নতিও হয়। **হায়! আজকের মুসলমান-শাসকরা যদি এই গূঢ় রহস্যকে অনুধাবন করে এভাবে নিজেদের রাজত্ব পরিচালনা করতো তাহলে কতই না উত্তম হতো**।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে হয়রত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক ব্যবসায়ীর ঘটনা বর্ণনা করতেন। সে বেশ কিছু টাকা শহরের কাজীর কাছে আমানত হিসেবে রাখে এবং এই কথা বলে সফরে যায় যে, ফেরার পর আপনার কাছ থেকে বুঝে নিব। সে যখন ফিরে আসে এবং নিজের টাকার থলি দাবি করে, তখন কাজী সাহেব সোজা অস্বীকার করে বলেন যে, আমি কোন আমানত রাখি নি, আর আমি কোন আমানত রাখিও না। কিসের থলি আর কিসের আমানত? সেই ব্যবসায়ী তখন তার সামনে অনেক লক্ষণাবলী বর্ণনা করে, কিন্তু কাজী অস্বীকার করে এবং বলে যে, আমি বলে দিয়েছি, আমি কোন আমানত রাখি না। এতে সেই ব্যবসায়ী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। অবশেষে কেউ তাকে পরামর্শ দেয় যে, বাদশা অমুক দিন দরবারে বসেন, আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাছে যেতে পারে। তুমিও গিয়ে নিজের এই সমস্যার কথা তুলে ধর। সেই ব্যবসায়ী তা-ই করে। কিন্তু তার কাছে যেহেতু কোন প্রমাণ ছিল না, তাই বাদশা বলেন, প্রমাণ ছাড়া তো কাজীকে অভিযুক্ত করা যাবে না। অবশ্য বাদশা নিজেই একটি পন্থাও শিখিয়ে দেন যে, অমুক দিন আমার বাহন এবং জুলুস বের হবে আর শহর অতিক্রম করবে। তুমি সেদিন কাজীর পাশে দাঁড়িয়ে পড়বে। কেননা বড় বড় মানুষ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য রাস্তায় উপস্থিত হয়ে থাকে। আমি যখন আসব, তখন অকৃত্রিমভাবে তোমার সাথে কথা বলব। তুমিও এমন ভান করবে, যেন তুমি আমার বন্ধু। এই ভয় পাবে না যে, আমি বাদশা, তাই কিছু হয়ে যাবে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করব যে, দীর্ঘদিন আমার সাথে সাক্ষাৎ কর নি। তুমি উত্তরে বলবে যে, প্রথমে তো আমি সফরে ছিলাম। আর ফিরে আসার পর যে ব্যক্তির কাছে আমার আমানত রাখা ছিল, তার সাথে এ নিয়ে ঝগড়া চলছে এবং তা উদ্ধারের চেষ্টা করছি। বাদশা বলেন, এরপর আমি তোমাকে সেখানেই ঐ কাজীর সামনে বলব যে, এই বিতন্ডার মীমাংসার জন্য আমার কাছে চলে এসো। তখন তুমি বলো যে, যদি সমাধান না হয়, তাহলে আপনার কাছে আসব। অতএব সেদিন যখন বাদশা আসে, তখন সেই ব্যবসায়ী এমনই করে, প্রশ্নোত্তর হয়। কাজীও বাদশাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত ছিল এবং এসব কথোপকথন

শুনছিল। এরপর বাদশার বাহন তাদেরকে অতিক্রম করে সামনে চলে গেলে কাজী সাহেব ব্যবসায়ীর কাছে আসে আর বলে, একদিন তুমি আমার কাছে এসেছিলে, আর কোন আমানতের কথা বলছিলে। আমার স্মরণ শক্তি দুর্বল, তাই কিছু লক্ষণাবলী আমাকে বল। ব্যবসায়ী তখন সেই একই লক্ষণাবলীর কথা পুনরায় উল্লেখ করে যা সে পূর্বেও বলেছিল। এখন যেহেতু কাজী বাদশার ব্যবহার দেখেছে, তাই তাৎক্ষণিকভাবে সে বলে যে, এই লক্ষণগুলির কথা তুমি আমাকে পূর্বে কেন বললে না। তোমার আমানত আমার কাছে সুরক্ষিত আছে। এখনই এনে তোমাকে হস্তান্তর করছি।

অতএব এক জাগতিক বাদশা, যার শক্তি সীমিত, তার সাথে বন্ধুত্ব যদি মানুষকে এমন মর্যাদা দিতে পারে যে, বড় বড় মানুষ তাকে ভয় করে, সেখানে এটি কিভাবে হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে কারো বন্ধুত্ব থাকবে, আর পৃথিবী তার চরণে লুটিয়ে পড়বে না? সুতরাং, সত্য ধর্ম অবলম্বনের মাধ্যমে মানুষ সারা পৃথিবী হস্তগত করতে পারে। মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে সাহাবীরা যে সম্মান লাভ করেছিলেন, জাগতিকতার দাসত্ব করে তারা তা লাভ করেন নি। বরং জাগতিক ক্ষেত্রে তারা যে উন্নতি করেছেন, তা ধর্মের অধীনস্ত হওয়ার কারণেই লাভ হয়েছে। কিন্তু এর জন্য ঈমান থাকা আবশ্যক। এমন ঈমান, যা খোদার সন্তুষ্টিকে আকর্ষণ করবে। যার ঈমান পূর্ণতায় সমৃদ্ধ ও নিখুঁত, সে কিভাবে উন্নত চারিত্রিক মূল্যবোধকে পরিহার করতে পারে? চারিত্রিক সকল সৌন্দর্য মানুষ যদি অবলম্বন করে এবং তা মেনে চলে, তাহলে সত্যতা, সততা, আমানত, তাক্বওয়া, পবিত্রতা, এ সবই তার অর্জন হবে। আর এর আবশ্যকীয় ফলাফল যা প্রকাশ পাবে তা হল, জ্ঞান, কৌশল, বুদ্ধি, যোগ্যতা এবং শ্রম—এক কথায় সবই তার নিয়ন্ত্রণে আসবে। আর এর উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে জাগতিক সাফল্যও তার লাভ হবে। তাই আধ্যাত্মিক সম্পর্কের প্রতি এক মু'মিনের সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি দেয়া উচিত। তাদের মতো হওয়া উচিত নয়, যারা বলে যে, মৌখিক স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। খোদার ভালোবাসা মৌখিকভাবে সৃষ্টি হতে পারে না বরং আন্তরিকভাবেই তা হওয়া সম্ভব। আর এমনটি হলে সবকিছুই মানুষের করায়ত্বে চলে আসে। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৭তম খণ্ড, পৃ: ৪৬৭-৪৭০)**

**কোন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত পরাকাষ্ঠা অর্জন না করবে, পুরস্কার পেতে পারে না**। ধর্মে প্রবেশের ক্ষেত্রেও পরাকাষ্ঠাই মানুষের কাজে আসে, আর এর জন্যই চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, আজকাল আমাদের মাধ্যমে তারা-ই লাভবান হয়, যারা সুগভীর সম্পর্ক রাখে। আবার পুরো বিরোধিতাকারীরাও লাভবান হচ্ছে, যেমন মৌলভী সানাউল্লাহ্ প্রমুখরা। অন্যান্য ছোট-খাট মৌলভীদেরকে কেউ জিজ্ঞাসাও করে না। অপরদিকে পূর্ণ নিষ্ঠাবানরাই লাভবান হয়। হালকা-সম্পর্ক কোন কাজে দেয় না। মানুষ যদি খোদার দিকে অগ্রসর হওয়া আরম্ভ করে, তাহলে তার সাথেও পূর্ববর্তীদের মতোই ব্যবহার করা হবে, এমনকি এ যুগেও তা সম্ভব। মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে এর জন্য চেষ্টা করে, তবেই এটি হবে। খোদার সাথে কারও কোন শত্রুতা নেই। যা প্রয়োজন তা হল, আমাদের নিজেদেরকে পরিপূর্ণরূপে খোদার হাতে সমর্পণ করা। আল্লাহ্‌র আস্তানায় সেজদাবনত হলে আপনা-আপনিই সবকিছু লাভ হবে। আর যেই উন্নতি আমাদের জন্য আবশ্যক, তা আপনা হতেই আমাদের লাভ হবে। এটি সাধারণ একটি দৃষ্টান্ত যে, আগুনের কাছে বসলে মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উষ্ণ হয়ে উঠে। সুতরাং এটি কিভাবে সম্ভব যে, মানুষ সবকিছু ছেড়ে আল্লাহ্ তা'লার কাছে এসে যাবে, আর আল্লাহ্‌র কৃপা থেকে সে অংশ পাবে না। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৭তম খণ্ড, পৃ: ৪৭০-৪৭১)**

**তাই আমাদের খোদা তা'লাকে লাভের চেষ্টা করা উচিত**, খোদার প্রেরিত ধর্মের বাস্তবতাকে অনুধাবনে সচেষ্ট থাকতে হবে, খোদার ভালোবাসা আমাদের জীবনে সহজাত ও

স্বাভাবিক বিষয়ে রূপ নেয়া উচিত। আর এটিই আমাদেরকে উন্নত নৈতিক মানে পৌঁছাবে এবং এতে করে জাগতিক উন্নতিও আমাদের লাভ হতে থাকবে। খোদার জ্যোতি থেকে অংশ লাভের চেষ্টা যদি আমরা করি তাহলেই আমরা সত্যিকার অর্থে কৃপা লাভ করতে পারি। এক একাগ্রতা নিয়ে যখন আমরা এই জ্যোতি থেকে অংশ লাভের চেষ্টা করব, তখন মিথ্যা, যা কিনা এক অন্ধকার, তা আপনা হতেই আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। আলস্য, প্রতারণা, ধোঁকা এবং অন্যান্য পাপ, অন্যের অধিকার পদদলিত করা, এই সবই অমানিশা। আর এগুলো খোদার জ্যোতির কারণে আপনা হতেই তিরোহিত হবে। আমাদের চারিত্রিক মানও উন্নত হতে থাকবে আর আমরা জাগতিক উন্নতিও লাভ করতে থাকবো। অতএব এই সমাজে বসবাসরত অবস্থায় নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে জাগতিকতার এই নেতিবাচক প্রভাব থেকে যদি মুক্ত রাখতে হয়, ধর্ম এবং নৈতিকতার সম্পর্ক যদি তাদেরকে বুঝাতে হয়, জাগতিক উন্নতিকেও সত্যিকার ধর্মের অধীনস্ত করে তাদেরকে, অর্থাৎ আগামী প্রজন্মকে যদি ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করতে হয়, তাহলে আমাদেরকেও খোদার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক-বন্ধন রচনার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন।

**(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫-২১ মে, ২০১৫, ২২তম খণ্ড, ২০তম সংখ্যা, পৃঃ ৫-৮)**
**কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।**